কবিতার গদ্য - মলয় গোস্বামীর কবিতা

পিউলি পাইন

মলয় গোস্বামীর কবিতা একেবারেই নতুন জগৎ নতুন ছন্দ, কবিতার মোহ থেকেশ্রেয় হয়ে উঠেছে মুক্তি।
যে-দিক দিয়ে আমি বের হতে পারবো না, ঠিক সেইদিকে একটি সচল ডাক ঘন্টি তার উপর কার আঙুল ! এ-দিকে ঘরের ভিতর আমার নিজস্ব কাজ সারি ললিত আঙুলে।...

.....

.....

যে-দিক দিয়ে বের হতে পারবো না, সে-দিকের সচল ডাক-ঘন্টির বোতামে একটি না-দেখা আঙুল চেপে থাকে। আর, ত ার ডাক-ধ্বনি ঘরের ভিতরের সব কিছুর সঙ্গে সঙ্গত করে "আমি বাইরে রয়েছি এসো, দরজাটা খোলো বাইরে রয়েছি, এসো, দরজাটা খোলো ..."
(ডাক-ঘন্টি)

প্রতিটি মানুষ নিজের কাজে ও সংসারে ব্যাপৃত থাকলেও প্রতি মূহূর্তে বাইরে থেকে কে যেন ডাকে। যে-দিক দিয়ে মানুষ কিছুতেই বের হতে পারবে না, যে-দিকটার দরজা বন্ধ, সেই দিকেই কলিংবেল বাজছে। একটি অচেনা আঙুল বেলটি টিপছে। সেই কলিং বেল-এর শব্দ মানুষের ঘরের ভেতর ঢুকে বলে চলে, আমি বাইরে রয়েছি, দরজাটা খোলা। ... কিন্তু কী করে যাওয়া হবে? ও-দিকে তো বেরবার উপায় নেই। কে ডাক দ্যায় এইভাবে? মৃত্যু? না-পাওয়া স্বপ্নর সময়?
কবি মলয় গোস্বামীর 'ডাক-ঘন্টি' নামক এই কবিতাটি আমরা পড়েছি আটের দশকে 'দেশ' পত্রিকায়। লক্ষ্য করলাম, ম ানব জীবনের সনাতন এক বিস্ময়কে এইভাবে প্রতীকি এবং জলজ্যান্ত ছবির মধ্যে দিয়ে মলয় তাঁর কবিতার আলাদা বৈশিষ্ট্য তৈরি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও দেখছি মলয় স্যাটায়ার এবং মজায় ভরা শ্লেষে তাঁর কবিতা উজ্জ্বল করতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতার ভাষা প্রথম থেকেই অন্যরকম এবং নিজস্ব। খুব গভীরভাবে তাকালে এই 'ডাক-ঘন্টি'র মতন কবিতাতেও তিনি শ্লেষের ইশারা রেখেছেন। কবিতায় 'ললিত আঙুলে' বলতেই শ্লেষ এসে যায়।
আটের দশকেই মলয়ের কবিতা লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। আটের দশকের 'দেশ' পত্রিকার একটি প্রবল বিতর্কিত সংখ্যায় (কবির লড়াই) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে বললেন, তুমি মলয় গোস্বামী বলে কারো নাম জানো? শক্তি বললেন, তিনি জানেন না। তারপর সুনীল বললেন, 'এ একদম কী বলব --- সুররিয়ালিস্টের ধরনের লেখে । থাকে কোন মফস্বলে। ছেলেটিকে আমি দেখিইনি। ডাকে তার কবিতা আসে। কিন্তু এর চিন্তাটাই অদ্ভুত। এ একেবারে নতুন ধরনের লিখছে।'
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করলাম যে কারণে তাহল, মলয় গোস্বামীর কাব্যভাবনা, বিষয়ভাবনা এবং ঘরান াভাবনা একেবারেই নতুন। নির্দিষ্ট ধারাবাহিক স্টাইলের বিরোধীতা তাঁর কবিতায় রয়েছে।
১৯৭৯ সালে প্রথম কবিতার বই, বেশ ছোট বয়সে --- 'স্মৃতিতে সময়ে ছুড়ি অলৌকিক জাল'। ২০০০-এ 'মনখারাপের বিলম্বিত গ'। একটা ভাববার বিষয় হলো, এত দীর্ঘবছর কবিতা লেখবার পরও কলকাতার কাব্যজগতের তেমন কোনো আলোচনার প্রশ্রয় না-পেয়েও কী ভাবে নিভৃতে, লুকিয়েই প্রায়, কবিতা চর্চা করা যেতে পারে! যদিও মলয় ১৯৯৭ সালে 'শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন।

প্রথম কবিতার বই-এর কবিতাগুলি পাঠ করলেই বোঝা যায় তার অন্যতর ভাবনা-বৈশিষ্ট্য। সত্তর দশকের অগ্নিস্রাবী দিনগুলিও কিন্তু তখনকার কবিতায় বিধৃত। প্রকৃত কবি কিছুতেই সময়-নিরপেক্ষ হতে পারেন না, এটাই সত্য।

'কোথায় লুকাবে? কাজ করা থামের আড়ালে?
ওদিকে গেলে রোমশ বাহুতে হা হা হাডুডু খেলবে মহাকাল
সিং দরোজায় ঝোলানো রয়েছে সিংহের আলজিভ
ছাদে যাবে রেলিং-এর পাশে?
ওখানে খোলাখুলি উদ্‌ভ্রান্ত অসহ্য রমণ ...'

এই কবিতাতেই কিন্তু মলয় একসঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন এ্যাবসার্ডিটি এবং রিয়েলিটিকে। এটা তাঁর কবিতার এক বিশেষ দিক। বহু কবিতায় দেখেছি যে, তিনি সুররিয়ালিজম-কে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করেন রিয়েলিজ্‌ম-এ। সৃষ্ট হয় অন্য ঘরানা।

সত্তরের সেই সময়ে মলয় রাজনীতি করেননি। কিন্তু সময় তাঁর মনে দগদগে ঘা রেখেছে। তাঁর প্রথম কবিতার বই-এ তেমনভাবে কোনো রাজনৈতিক কবিতা না থাকলেও চলে এসেছে অন্যভাবে ভয়ংকর দিনযাপন সমূহ। কয়েকটি কবিতাংশ এখানে তোলা যাবে।

'চাতালে অমনভাবে হেঁটোনা/হোকনা যতই নিপুন পদক্ষেপ তোমার সার্কাস মাস্টারের মতো/প'ড়ে যেতে পারো/বিষম পিচ্ছিল এখানে ভীষণ শ্যাওলা! ...' (আচমন)

'এলিয়ে দিসনে তোর মুঠো করা হাত অপরের কাছে/ আমন তোলার সময় ভেবে দ্যাখ্‌তো তুই/কতদিন হা কোরে কোনো কথা বলিস নি?/ অসুখ হয়েছে, ভালো, সিম্পটম নিজে খুঁজে দ্যাখ...' (সেরে যাবে সমস্ত মানুষ)

'উপুড় প্রদীপে বস্তুত কোনো কাজ হয় না/চিৎ করে দিলাম কারণ তাতে আমি আগুন জ্বালাবো'(উপপাদ্য ২০)

'এখানে বাঁচার জন্যে দাপাদাপি উদ্‌ভ্রান্ত হা-হুতাশ/বৃদ্ধেরা গেছেই মরে লক্ষ্যণীয় যুবকদের অসম্পূর্ণশ্বাস/এখানে বাঁধে না কেউ অনিতম্ব ঢেউ ঢেউ চুল/এখানে নিরন্নের মাঝে দ্যাখো শুধু মৃত্যুর আভাস' (স্বদেশ)

প্রথম কবিতার বইটিতে শুধু যে বড়ঝঞ্ঝামুখর দিনগুলির কথাই রয়েছে, তা কিন্তু নয়। কবি তখনও সোজাসুজি প্রেম, প্রকৃতিকেও এনেছেন। এখানেই মলয়ের মন-বৈশিষ্ট্য। মন যা চায়, তাই উঠে আসে তাঁর কবিতায়। এই কাব্যগ্রন্থেই 'কঠিন ক্যালকুলাস' নামক কবিতায় তিনি লেখেন--- 'টেবিলের ঠিক মধ্যিখানে কাব্যটা ছিলো। ওটা দিবানাথের।/নাড়িয়ে দিলো। গরম চা চল্‌কে ওঠে ঢেউ-এর মতন।/ তপন বলে, "ঢেউ! ঢেউ!" অন নিজের কাপটা আনেন/দিবানাথের কাছে। গায়ে লাগিয়ে জোরসে নাড়ায়/হিমঘ্ন তার কাপটা ।সবাই হোঃ হোঃ করে দোকান ফাটায় "তুফান! তুফান!"/

পরে আরো আছে এই কবিতায় ।কঠিন ক্যালকুলাসের মধ্যের ব্যক্তিদের নামগুলো হল দিবানাথ, তপন, হিমঘ্ন ।যদি বোঝা যায় যে এদের প্রত্যেকের নামের অর্থই হলো সূর্য, তাহলেই কবিতাটি আর কঠিন থাকে না। সমাজের ইচ্ছাকৃত কাঠিন্যের প্রতি ঘৃণা ছোঁড়া হয়েছে কবিতাটিতে।

সুদুর সীমান্ত শহর বনগাঁ থেকে ডাক মারফৎ কবিতা পাঠিয়েও আটের দশকে তাঁর কবিতা প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় লিখেছিলেন 'জামা' নামক একটি কবিতা। 'নিজেকে হ্যাঙারে রেখে জামাটাকে পথে বের করি।/ বেশ লাগে চতুরালি, বেশ চলে চিটিং-বিলাস।' তাঁর কবিতায় সবসময় উঠে এসেছে ব্যক্তি ও সমাজের মেকি দিকগুলো। সেখানে আঘাত হানার জন্যে কলমে তুলে নিয়েছেন স্যাটায়ার। পরাবাস্তব কবিতার একটা আলোছায়া দিয়ে ঢাকা থাকলেও তাঁর কবিতা পরিশেষে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে, যা তাঁর নিজস্ব। সেই সময়ের জনপ্রিয়তম কবিতার মধ্যে রয়েছে 'ডোবারম্যান', 'ভাসপক্ষী', 'পাখিরা মানুষেরা', 'জরা ও যৌবন' প্রভৃতি।

এ সমস্ত কবিতা আটের দশকে বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকাতে প্রকাশিত হলেও গ্রন্থিত হলো ১৯৯৮ সালের বইমেলায় প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অচেনা জামা'-য়। এই কবিতাগুলি নিয়ে বলবার আগে অন্য একটি প্রসঙ্গ দেখা যাক। বহুদিন আগের দেশ পত্রিকার একটি সংখ্যায় জগন্নাথ চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা' প্রসঙ্গে মলয় গোস্বামীর ছন্দের দক্ষতা সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লিখেছিলেন এরকম--- এই কবির হাতের সমস্ত রকম ছন্দ এবং চটুল ছন্দের নিপুণতা বিস্ময়কর। সত্তরের কবি অমিত চক্রবর্তী সাম্প্রতিক একটি পত্রিকায় মলয়ের ছন্দ প্রসঙ্গে বলেছেন, বাংলা কবিতার ছন্দের

পুঁজিপতিদের অন্যতম হলেন মলয়। ছন্দের ট্র্যাপিজের খেলায় অনেকেই দক্ষ। কিন্তু ছন্দের .... সাফল্য সবার আসে না। তা মলয়ের কাছে খুবই সহজে আসে।
ছন্দের প্রসঙ্গে প্রায় সমসাময়িক কবি জয় গোস্বামীর ছন্দ বাংলার আপামর কবিতা-রসিক বিনম্র চিত্তে গ্রহণ করে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছে। তাঁর থেকে কিছু পরে এলেও আর এক গোস্বামী, মলয়, তাঁর পাশাপাশি নিজস্ব বৈচিত্র্যের অসাধারণ ছন্দ রেখেছেন। সংস্কৃত পণ্ডিত পিতার গান বাজনা জানা বাড়ির সন্তান মলয় নিজেই একজন গায়ক। একটি পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ছন্দ সম্পর্কে বলেছিলেন, ছন্দ তো ঠিক সেইভাবে শেখা যায় না, মাত্রা গুনে গুনে বসালেও দেখা যাবে ঠিক মিলছে না। এগুলো সহজাত। ছন্দ তো থাকতেই হবে। গাছের পাতাটাও ছন্দেই পড়ে। এই জন্যেই হয়তো মলয়ের কবিতায় প্রায়শই ছন্দ, গানের অণুষঙ্গ এসে পড়ে। সত্যিই, ছন্দ মলয়ের করতলের আমলকীর মতন। তিনি যে ছন্দে কবিতা লেখেন, এ নিয়েও মজা করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'ডোবারম্যান' কবিতায় ----
'কে বলে ছন্দে লিখি? পশুর মতন গন্ধে লিখি।
গন্ধে ধন্দে পরমানন্দে ভালই আছি কয়েন দাদা?
যেখানেই রক্ত দেখি --- নাক দিয়ে হই গোয়েন্দা-দা
তারপর তীক্ষ্ণ পায়ে উৎসমুখে ছুটতে থাকি। ....'
ছন্দ প্রসঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও বলতে হয়। প্রচুর কবিতা তিনি লিখেছেন এক বিশেষ ধরনের ছন্দে, যা বাংলা কবিতায় একমাত্র তাঁরই। মলয় অবশ্যই দাবী করতে পারেন এই ছন্দের তিনিই জনক। বৈয়াকরণিকগণ এ ছন্দের নামকরণ কী করবেন তা পরের ব্যাপার। সেই ছন্দে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'মাধুরী দীক্ষিত নয়, মাধুরী সাঁপুই'। পাঠকের প্রথম দু'চারটি পংক্তি স্মরণ করলেই বুঝতে পারবেন অবশ্যই ----
" ভিডিও হলের পাশে যে-লোকটা ভাজা বেচে, তার মেয়ে মাধুরী দীক্ষিত। টাইটেল দীক্ষিত নয়, সাঁপুই, কিন্তু সে মনে মনে দীক্ষিত বসায়। ঘরে গিয়ে খসায় সে একে একে ছেঁড়া কাথাকানি। বেড়ায় ঝোলানো আয়না; জীবনের চরম ব্যথায় চিড় খেয়ে গেছে! পায়না প্রতিবিম্বে সে পালি পর্দার মাধুরী।....
'পাতাল-যামিনী' কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল আটের দশকে শারদীয় দেশ পত্রিকায়। সম্ভবত মলয় এই ছন্দে পাতালাযামিনী কবিতাটিই প্রথম লেখেন।
'তবে বলো দ্যাখা হলো পাতাল-যামিনী। যেখানে জলের
মধ্যে ভেসেছে বকুল, আর, ভেঙে গেছে কমলে কামিনী, যার,
মরেছে মুকুল। তবে সে কি মুখকালো মোমবাতির মুখ
শুধু শুধু হয়েছে উপুড়, ভেঙে বুক! আমি তার কাছে এনে দেবো
সেতারের ঝালার মতন অভ্র দুপুর। পাতাল-যামিনী আমি
কোনো দিন এমন ক'রে গভীরে নামিনি। ...'

ছন্দের বিষয় যখন হচ্ছে তখন 'অচেনা জামা' কাব্যগ্রন্থের 'বিপ্রম্লিকা' কবিতাতে দেখছি কবিই লিখছেন ছন্দের কথা। আমরা এখানে ছন্দ সম্পর্কে কবির অন্য এক ধরণের উপলব্ধির কথা বুঝতে সচেষ্ট হব।
"যদিও ছন্দ জানি ; ছন্দবাণীর ফাঁকে ফাঁকে
এ জীবন কুয়াশাবিধুর, তার মৃত্যু লুকিয়ে রাখে।
'বিনিপাত' ছন্দে এলো; অর্থ ব'লি --- অধঃপতন।
এইমত সমানুপাতে সাজিয়ে রাখি ইঁটের মতন।"
রোমান্টিক কবিতাতেও মলয় সিদ্ধহস্ত। আমরা বুঝতে পারি যে নিখাদ প্রেমের কবিতা তাঁর কলমে সামগ্রিক রূপ নিয়েই উঠে আসে। মাঝে মাঝে এই বিশ্বাসও আমাদের হয়ে পড়ে যে তিনি একেবারেই প্রেমিক কবি। অলি তাঁর প্রেমিকা। সেই অলি কখনও কখনও স্ত্রী হিসেবেও তাঁর কবিতায় আসে।
'তাৎপর্যপূর্ণ মেঘে বৃষ্টি যদি হয়/আমি তোমার সঙ্গে যাবো নিশীথ সন্ধ্যায়।/জানলা খোলা, থাকবে ব'সে বাড়ির বাধঁন

মেনে/ ঘোর অন্ধকার মুখে তোমার, একটি হেরিকেনের/ মৃদু আলোয় রহস্যময়, চেনা-ই তোমার দায়/আমি তোমার স াথে যাবো শ্রাবণ সন্ধ্যায়।'

এই সাধারণ একটি প্রেমের কবিতাতেও মলয় প্রথমেই 'তাৎপর্যপূর্ণ মেঘে'র মতন অকাব্যিক শব্দবন্ধটি বসিয়েও কী অসাধ ারণ তাৎপর্যময় করে তুললেন, তা লক্ষ্য করার বিষয়। এঁর হাতে কঠিন প্রায়-অব্যাবহৃত তৎসম শব্দের পাশেই একটা অন্তজ শব্দের মিলন চলে যায় একেবারে উদাহরণ স্তরে।

মলয়ের কবিতার জগৎ জুড়ে রয়েছে প্রেম, প্রতিবাদ, নিজেকে নিয়ে মজা, মানুষ ও বিশ্বের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের স ম্পর্ক, নারীর প্রতি পুষতান্ত্রিক সমাজের কৌশলী অত্যাচার, বর্তমানের সঙ্গে আগামী প্রজন্মের সম্পর্ক , কুটিল রাজনীতির কালো দিক, ... কী নেই তাঁর কবিতায়! সময় ও কাল-কে ধরে তিনি ক্রমশ এগোচ্ছেন। সন্তান, শিশু, ঈশ্বর কোন কিছুই তঁ ার স্পর্শহীন থাকছে না। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেতে তাঁর সর্বগ্রাসী ক্ষুধাই তাঁকে পৌঁছে দিচ্ছে সামগ্রিক জগতে। কিন্তু মানুষের চারপাশেই তাঁর গোপন ঘোরাফেরা। মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। 'পাখিরা, মানুষেরা' কবিতায় তিনি ম ানুষকে এই ভাবে দেখছেন যে, পাখিকে মিথ্যে কথা বলতে বললে সে বলতে পারে না। কিন্তু মানুষ বলে। পাখিকে কাউকে অপমান করতে বললে, পারে না। কিন্তু মানুষ করে। মানুষকে স্বর্গ রচনা করতে বলতে, মানুষ পারে বলে জনায়। কিন্তু পা খি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

কবিতা সম্পর্কে মলয়ের বিশ্বাস একটি পত্রিকায় রেখেছেন। ----

"... এখন মনে হয় --- কবিতার মধ্যে সকল কল্যাণকে আহবান করতে হবে। ছন্দোময় প্রেম, যুদ্ধ, আলো অন্ধকার, চুম্বনের শব্দ, সব কিছুই একদিন কবিতায় কল্যাণময় হয়ে প্রবেশ করবে। .... কবিতা হল একরকম তীর্থ। সেখানে মানুষ যাবেই একদিন। এ আশা আমার রয়েছে। সেই তীর্থে বসানো হবে ছন্দের নদী; তার জল হবে ....। ইশারার গাছে গাছে বসবে অনুভবের পাখি। ছায়া হয়ে নামবে আনন্দ। এসব মনে হয় আমার।'

এখানে মলয় কবিতার কাব্যভাষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত রেখেছেন --- "হয়তো, হয়তো কেন, আজকের এই আধুনিক ক াব্যভাষাও আগামী ১০ বছরের মধ্যে পুরনো হয়ে যাবে। অন্য কাব্যভাষা গায়ের এবং সময়ের জোরেই জুড়ে বসবে। ত াহলে কবিতার কী থেকে যাবে?

থেকে যাবে ছবি এবং সত্য। তাই আমার কবিতা জুড়ে দেহ দেওয়ার চেষ্টা করি এক একটি ছবি-কে। ছবিগুলি উঠে আসে আমার সংসার, অন্য ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে। এই-ই কি শ্রেয়? আমি শরণাপন্ন তাই কবিতার কাছে। কবিতার মে াহশক্তি থেকে আমার কাছে শ্রেয় মুক্তি। ব্যক্তি ও পৃথিবীর মধ্যে যে লুকানো আনন্দ আছে তা-ও প্রকট করার দিকে আমার কবিতা যেতে চায়।'

তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভবে যতই বলুন যে দশ বছর পরেই ভাষা পাল্টে যাবে। থেকে যাবে ছবি এবং সত্য; কিন্তু তার প্রত্যেকটি কবিতাতেই এক মোহময়ী কাব্যভাষা থাকে, যা পাঠকদের রহস্যময়তার দিকে নিয়ে চলে। এতে পাঠকের মোহ তৈরি হয়ই। কবিতা সম্পর্কে মুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়ে কি না বোঝা যায় না। সেই রহস্যময় ভাষা মলয়ের হাতে রয়েছে।

'অচেনা জামা' কাব্যগ্রন্থেই বারবার তার সেই রহস্যময় কাব্যভাষার সামনে এসে পড়ি আমরা। কখনও কখনও ছন্দে কখনও ছন্দহীনতার সঙ্গে। কখনও কখনও এমনও দেখা যাচ্ছে যে কোনো সোজাসুজি বক্তব্যই পরিগ্রহ করছে নতুন এক ভ াষাশরীর।

'নাগিনী জ্যোৎস্নায় ভাসছে মঝুমের জামা। মঝুম কোথায় গেল?/ শুধুমাত্র জামাটার নীল রঙের ফোঁটা উঠোনে রয়েছে। আমি খুব/নীল-প্রিয় মানুষ। তাই এক আরম্ভের সময় দু'হাতে সমস্ত নীল/আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তা থেকে সমুদ্র, গ াছ...'

(রহস্যাবৃত)

'ঠান্ডা গল্প-মাখানো সব বসত বাড়ি, নিঃঝুম দোকান, পথঘাট/ আমি নেমে পড়েছি এখানে মাকড়সার জাল বেয়ে রাত্রির মতন/ভয় করছে, পাথর খন্ডের মতন অচঞ্চল কুকুর, তার মুখে/ঝুলত জ্যোৎস্না/আহ্ ঢোঁক গিলি, কার লুণ্ঠিত অন্তর্বাসে আলো পড়ে কার।/কার?....'

(নিঝুমপুর)

‘চুতু র্দিকে টর্চের কাঁচের মত ফাঁকা/ তুমি এগিয়ে আসছে, দুলে দুলে বেরিয়ে পড়ছে তোমার/প্লাস্টিকের স্তন, নাভিপদ্মের সোনালি স্রু, সংখ্যাতত্ত্ব/কেঁপে উঠল নৌকার মতন টানা নয়নে তমিস্রা, তবু/শুধু ওরা কেন, আমলা সৌরভ কেন, আমি/যে একদা পৃথিবীতে বিলম্বিত ঠুংরির মতন সন্ধ্যা/নামলেই নিজের মাথাকে দেশলাই কাঠির মতন জ্বালিয়ে/সমস্ত গৃহে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলাম...’

(রহস্যময়ী একটি অরাজনৈতিক কবিতা)

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সময়ে জীবনানন্দ দাশ বাংলা কবিতাকে অন্যভাবে ভেবেছিলেন সাংঘাতিক ভাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর জীবিতকালে তাঁর কবিতার মূল্যায়ণ হ’ল না। যদি হত তাহলে বাংলা কবিতা হয়তো আরো অন্যরকম হয়ে যেত এসময়ে। ‘কৃত্তিবাস’ গোষ্ঠীর কবিরা সত্যি সত্যিই বাংলা কবিতাকে ঘুরিয়ে দিলেন। শক্তির মধ্যে বিনয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দের পরম্পরা গোপন-প্রকট থাকলেও, তাঁদের কবিতা তাঁদেরই হয়ে উঠেছিলেন। সুনীল ছিলেন বলতে গেলে বেশি-নিজস্ব। তারমধ্যে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় একেবারে পথের কথাকে কবিতা করে দিলেন আশ্চর্যজনকভাবে। .... যদি সত্তরকে দেখা যায় তাহলে একটু বড় মণিভুষণ ভট্টাচার্য, বাংলা কবিতায় সেই সময়কার তুফানসমূহকে প্রবেশ করিয়ে ঐতিহাসিক মাত্রা দান করলেন। মৃদুল এলেন। পার্থ প্রতিম, একটু আগে তুষার র ায, ভাস্কর এলেন, অন্যভাবে শ্যামলকান্তি এলেন, সুবোধ সরকার এলেন। কিন্তু একেবারে আগ্রাসী অন্যমাত্রা নিয়ে এলেন, জয় গোস্বামী। কবিতায় অন্য জগৎ নিয়ে চলে এলেন এবং সবার চেয়ে বেশি করে এবং দ্রুত মন জয় করলেন প াঠকদের। তুমুল জনপ্রিয়তা এখন তাঁর। এতসব নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত কবি দলের মধ্যে প্রায় আড়ালে, দুরে থেকে কবিতা লিখে চলেছিলেন মলয়। প্রকাশিত হয়েছিল কম সংখ্যায়। কিন্তু এক অশ্রুতপূর্ব ছন্দ এবং বিষয় নিয়ে তার লেখালেখি হল। বড় প্রকাশন থেকে এখনও তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। এঁটা তাঁর দুর্ভাগ্য। হয়ত তাঁর নিরলস কাব্যচর্চা সংস ারকে নষ্ট করেছে। তিনি একটি কবিতায় হয়তো তাই লিখছেন----

ঝলমলে গ্রন্থনবিদ্যা আয়ত্বে আনতে গিয়ে/সুদূরে ছিটকোয় পরিবার।/অত্যন্ত সুদূরে মুখ আমার ছেলের; ধূসর গাছের গুঁড়ি/ তার ওপাশে হারিয়েছে স্ত্রী!/ঊর্ণনাভ, ঊর্ণনাভ, আমি একলব্য হই; তুমি আমায় / ভিক্ষা দাও বুনন ঘরাণা’ (তেরটি প্রতনু)

খুবই স্পষ্ট অভিব্যক্তি এখানে তার। কিন্তু মলয়ের বিশেষত্ব গড়ে ওঠে ‘একলব্য’-র মিথ ব্যবহার এবং ঊর্ণনাভ-র কাছ থেকে বুনন ঘরাণার ভিক্ষা যাচ্ঞা। মিথ এবং পরাবস্তাবতা একাকার হয়ে তৈরি বাংলা কবিতার সম্পূর্ণ এক নতুন ঘরাণ া। আগে যা ছিল না। মলয়ের বহু কবিতায় মিথ, নীতিধর্মিতা এবং প্রবহমান চিত্রময়তা থাকে। পৌরাণিক ঘটনা এবং চরিত্রকে চকিতে আশ্চর্যজনকভাবে ব্যবহার করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অসম্ভব সাটায়ারের পাশেও জুড়ে দেন ভীষ্ম, দ্রৌপদী বা উতংক-কে। শব্দ ব্যবহারে তাঁর মতন দক্ষ কবি কড়ে গোনা। ‘বিষমমঙ্গল পুরাণ’ নামক কবিতার একটি পংক্তি আমরা দেখি। ‘জৃম্ভনে এলায় মন্ত্রী মিটিং সময়।’ সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। দেখা যাচ্ছে কোনো কাব্যগ্রন্থেই এটি মুদ্রিত নেই। ‘জৃম্ভন অর্থ হাইতোলা। মিটিং-এর সময় মন্ত্রী এলিয়ে পড়েছেন। এই রকস্টক মলয় শৈল্পিক শব্দবন্ধে তুলে এনে জুড়ে দেন ধ্রুপদী এবং জনপ্রিয় কবিতায়। ঈর্ষণীয় ক্ষমতা তাঁর।

মলয়ের কবিতার জগৎ জুড়ে রয়েছে তীক্ষ্ণ উইট, যা একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করে। আমরা নড়ে বসি। ‘শ্রীযুক্ত বামপদ রায়’ সিরিজের কবিতাগুলি তার অব্যর্থ প্রমাণ। কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁকে ধরা যায় না। আনপ্রেডিকটেব্‌ল। যেন এক অস্থির সময়ের মুখপাত্র তিনি। নিজের জীবনের অস্থিরতা, পেশার অস্থিরতা তাঁকে যেমন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, বিষয়ও তাঁকে তাড়িয়ে ফেরে। মলয় সঙ্গীত নাটকে সুদীর্ঘ বছর ব্যস্ত রেখেছিলেন, তাই এই দিকটি কবিতায় ছায়া ফেলে। কবিতা সে জন্য ব্যর্থ না হয়ে অন্য মাত্রা পায়। কাহিনী ঢুকে পড়ে অনায়াসে। ‘প্রত্নতত্ত্ব’ নামে একটি কবিতায় বর্ণিত হয়েছে একজন শিলকাটাই ওয়ালার বৃত্তিধবংসের কণ কাহিনী। বিজ্ঞানের চাপে কেউ আর শিল নোড়ায় বাঁটনা বাঁটেনা। এই কবিতায় কী অনায়াস দক্ষতায় প্লুতস্বর (কাটাবেন শি-ই-ই-ই-ল্) ব্যবহার করে জীবন্ত করে তুলে দেন কবিতায় বর্ণিত গরীর মানুষটির ব্যথা। এ কবিতা এক অনন্য সৃষ্টি। মলয়ের নিজস্ব অর্থনৈতিক অবস্থা চূড়ান্ত কণ বলেই তিনি ক্ষীণ পেশ াজীবীদের দুঃখ অনুভব করে শিল্পিত করেন।

‘অচেনা জামা’-র পরে তার একটি কাব্যপুস্তিকা প্রকাশ করেছে ‘এবং রাহী’পত্রিকা--- ‘মন খারাপের বিলম্বিত গ’। অদ্ভুত

এই নামের কাব্যপুস্তিকাটি একেবারেই ভিন্ন স্বভাবের। আত্রমাণাত্মক স্যাটায়ার এবং উদ্দেশ্যমূলক উইটের খনি এটি। এই বই-টি সম্পর্কেও মলয়ের লিখিত জবাব আছে। তা এইরকম--- এই বই-এর কবিতাগুলি বড় সিনিক। ঠিক স্যাটায়ার হয়ে ওঠেনি সবগুলি। এক দুঃসহ সময়ের দ্রুত ফসল। জানি, হয়তো এই কবিতাগুলি নিয়ে অনেকেই নাক সিঁটকোবেন। কিন্তু এ-ও আমার কাছে এবং আমার মতন অনেকের কাছে সত্য। রক্তমোক্ষণ না-হলে যেমন ব্লাডপ্রেসারের রোগীকে বাঁচানো যায় না, তেমনি এই কবিতাগুলি না লিখলে আমার জ্বালা জুড়াতো না। মনে জ্বালা তো তেমন কাউকে বলা যায় না। তাই লিখে বাঁচি। একধরনের সাকসান-মেথড। ফোঁড়া কেটে পুজঁ বের করে দেওয়া।'

এক অন্য ধরণের লুকিয়ে থাকা মনোসমাজের কথা এতে পাওয়া যাচ্ছে। কবি দুর্দমণীয়ভাবে নিজেকে নিয়ে পরিহাস করতে করতে একধরণের কালো জগৎকে আলোয় আনার কথা ভেবেছেন। এ একান্তই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি কবিতার পংক্তি পড়া যাক।

১। ধীরে ধীরে ঢুকে যাচ্ছো; বুঝতে পারছ না
এক সকালে দেখবে জেগে... ছদ্মনামে আছো। (পরিহাস)

২। অলি তুমি শুনতে পাচ্ছ? সংস্কৃতির মহানভানুর
মরা গাঙে বান এসেছে!... সহস্রাব্দ মহাকাশে
উড়িতে দিও গানে গানে .... ছড়িয়ে দিলাম কুমার শানু
এই মরেছে! টানতে লুচি শাহ্‌খ খান এগিয়ে আসে!
ঠাকুর! আমি নাম করেছি। এগোই সংস্কৃতির টানে...
নৌকা চলে... নৌকা চলে... আঁতরজাতিক গানে গানে... (আঁতরজাতিক)

৩। উপর এবং নিচের ওষ্ঠ নেই!
নাম দিয়েছে আমার-সদানন্দ।
ধাক্কা মারছ, তবু প্রকাশ দাঁতের...
পাগলের তো গো-বধেও আনন্দ ! (সদানন্দ)

৪। টিকটিকিকে পাম্প করেছি... গহীন কৌশল।
ওপর থেকে বোঝা যাবে না। তলায় চোরা স্রোত
আড়াল থেকে অনেক গল্প এগিয়ে চলে যায়----
সবাই ভাবে খেলার ছলে পাম্প করেছি কষে (কুমীর)

৫। কুকুর দাসত্ব দিয়ে কিভাবে এসেছে
ভক্তপ্রাণ লোকদল ভক্তি বলে জানে
আসলে যা আটমাত্রা, দু'বার বাজালে
একই খাপে পুরে দিলে ষোল মাত্রা হয় (নির্ণেয় উত্তর)

৬। গোপনে, হ্যাঁ, ... খুব গোপনে, লিখে রাখি আমার কথা
ছেলেকে আমি যে কারণে বইপত্তর পড়াই নি
সে আর তুমি জানবে কী গো রান্নাঘরের অঞ্জলি!
বই পত্তর পড়লে ছেলে ---- রিক্সা টানতে পারবে কী? (গোপন কথা)

এই কাব্যপুস্তিকায় ‘মম দুঃখ বেদন’, ‘পন্থা’ প্রভৃতি কবিতা একাকী পাঠ করলে, কবি যে আর্থনৈতিক সমাজের মানুষ, সেই মানুষদের প্রতি বিভিন্ন ধরণের চাপ এবং তার কৌশল উপলব্ধি করা যায় এবং চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠেই।
সুদীর্ঘ বছর ধরে কবি মলয় গোস্বামী বাংলা কবিতায় অংশগ্রহণ করে কবিতার দিকবদল তো ঘটিয়েইছেন, উপরন্তু যোগ করেছেন নতুন নতুন মাত্রা। প্রবল বাধা-বিঘ্ন, দুঃখ-কষ্ট যেমন তাঁর কাছ থেকে মানুষের প্রতি বিশ্বাস ছিনিয়ে নিতে পারেনি, তেমন তিনি নিজেও মনে করেন, কবি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেনই।
‘উপায়হীন’ নামক কবিতাতেও তিনি এরকম বিশ্বাসই ব্যক্ত করেছেন।----
‘হিস্‌হিস্‌ বৃক্ষদল, ফোঁস ফোঁস নদীজল ধারা/ আমাকে তাড়াতে এসে/ হয়ে পড়ে নিজেই পাহারা/... বৃক্ষদল হিম্‌হিম্‌ নদী জল ফোঁস ফোঁস করে/ ভয় দিতে এসে শেষে / গান গায় এ কবি-কে ধরে।’

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com